সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা

মুহম্মদ মতিউর রহমান

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

বাংলা সাহিত্যে শুদ্ধতম কবিদের অন্যতম সৈয়দ আলী আশরাফের জন্ম- ৩০ জানুয়ারী, ১৯২৪; মৃত্যু- ৭ আগস্ট, ১৯৯৮। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ, , খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী ও মহান আধ্যাত্মিক পুরুষ। তাঁর এসব পরিচিতির মধ্যে একটি সাধারণ পরিচিতি হলো তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম এবং এ পরিচিতিই তাঁকে সকল কাজে প্রেরণা যুগিয়েছে। তাঁর সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমানের প্রতিফলন ঘটেছে। জ্ঞান-বুদ্ধি-শিক্ষা অভিজ্ঞতায় তিনি একজন অতি আধুনিক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব হয়েও বিশ্বাসের প্রগাঢ়তায় ছিলেন অতিশয় দার্ঢ্য। সাহিত্যসহ তাঁর সকল কর্ম-কৃতীতে এর পরিচয় প্রতিবিম্বিত। তিনি তাঁর বিশ্বাস বা জীবনাদর্শকে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি-প্রমাণের আলোকে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। অন্ধ বিশ্বাস অথবা গোঁড়ামীর বশবর্তী না হয়ে তিনি যুক্তি ও প্রজ্ঞার আলোকে তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তাকে শাণিত করেছেন। তবে যুক্তি ও প্রজ্ঞার সাথে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের গভীর অনুভূতির সমন্বয় সাধন করে তিনি তাঁর সাহিত্য চর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। ফলে তাঁর সাহিত্যে বিশ্বাস ও জীবনাদর্শের গভীর উপলব্ধি সঞ্জাত অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। সকল মহৎ কবি-সাহিত্যিকই এ কাজ করেছেন। টি.এস. এলিয়ট, বার্নাডশ, ইবসেন, হাফিজ, রুমি, ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সকলেই সাহিত্যে কোন না কোন তত্ত্ব বা জীবনাদর্শ ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে তা তাঁদের ব্যক্তিগত অনুভূতির মোড়কে এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, তাঁদের সাহিত্য কখনো তাঁদের মতাদর্শ প্রচারের বাহন বলে মনে হয়নি। ফলে তা হয়েছে নিরেট সাহিত্য। সৈয়দ আলী আশরাফও উপরোক্ত বিশ্ব-বিখ্যাত কবিদের মতোই একজন অতিশয় সচেতন বোদ্ধা কবি-ব্যক্তিত্ব। তাঁর কবিতা ও জীবনের অন্যান্য কর্মকাণ্ডেও এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্যযোগ্য।

সাহিত্য ক্ষেত্রে সৈয়দ আলী আশরাফের আবির্ভাব চল্লিশের দশকে, যদিও তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ □চৈত্র যখন□ প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সনে। চল্লিশের দশকে আমাদের সাহিত্যে তিরিশোত্তর যুগের কবিদেরই প্রতাপ চলছিল। এ দশকের অনেক কবিও তিরিশোত্তর যুগের কবিদের পরাক্রমের কাছে নিজেদের স্বকীয়তা বহুলাংশে বিসর্জন দিয়েছিলেন। এ দশকের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কবি ফররুখ আহমদ ছিলেন এর প্রধানতম ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর আপন প্রতিভা, স্বকীয়তা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে তিরিশের কবিদের প্রভাবকে অনেকটা নিষ্প্রভ করে দিয়েছিলেন। ফররুখ তাঁর অপরিসীম নিষ্ঠা ও প্রতিভার বলে তাঁর স্বাতন্ত্র্যধর্মী কাব্যে স্বকীয় বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের এক নতুন বর্ণাঢ্য ভুবন তৈরিতে সক্ষম হয়েছিলেন। চল্লিশ দশকের যুগ-চেতনা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জ্বরা-মৃত্যু-মহামারী আক্রান্ত বাংলাদেশ, স্বাধীনতা আন্দোলনে উন্মুখর সমকালীন অবস্থার চিত্র ধারণ করে ফররুখ আহমদ এ সময় জীবনধর্মী সাহিত্য রচনায় সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। কবি শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, বে-নজীর আহমদ, সুফিয়া কামাল, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন এঁরা সকলেই কম-বেশি সমসাময়িক অবস্থার বিবরণ তুলে ধরেছেন তাঁদের কাব্যে। সৈয়দ আলী আশরাফও এ চল্লিশের দশকেই কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন।

তিরিশোত্তর যুগে আমাদের সাহিত্যে, বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে বিশ্বাসের ধ্বস নেমেছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তখন তেমন প্রবল ছিল না। মূলত রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করেই তিরিশের কবিরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। তিরশোত্তর যুগে আমাদের সাহিত্যে দু□টি সুস্পষ্ট ধারা প্রবহমান ছিল। একটি হলো বিশ্বাসহীন, ধর্মহীন, আপন ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতি আস্থাহীন নতুন মানবতা-সন্ধানী ধারা। এতে পাশ্চাত্য দর্শন ও চিন্তাধারার যেমন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় আবার তেমনি কমিউনিজমের নাস্তিক্যবাদ, সামাজিক দ্বান্দ্বিকতা ও প্রগতিবাদের প্রভাবও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যটি হলো, ধর্মের মূলগত আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও সেই উপলব্ধিজাত

মানবতার মানদণ্ডকে নতুনভাবে বিকশিত করা এবং ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের আলোকে নতুন পৃথিবী গড়ার দৃঢ় আশ্বাসে পূর্ণ একটি আস্তিক্যবাদী ধারা।

প্রথমোক্ত ধারার কবিদের মধ্যে জীবনান্দ দাস, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমরসেন, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা একদিকে যেমন পাশ্চাত্য চিন্তা-দর্শনের অনুসারী ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি প্রাচ্যের কমিউনিজম ও নাস্তিক্যবাদের দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন। তাঁদের কাব্যে এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। দ্বিতীয় ধারার কবিদের মধ্যে যাঁরা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য তাঁদের নাম আগেই উল্লেখ করেছি। তবে এঁদের পূর্বসূরী হিসাবে কাজী নজরুল ইসলামের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৯২০ সনের দিকে কাব্য-ক্ষেত্রে বর্ণাঢ্য আবির্ভাবের সময় থেকেই নজরুল এক আস্তিক্যবাদী প্রবল শক্তিশালী ধারার উদ্যোগতা হিসাবে চিহ্নিত হন। তবে চল্লিশের দশকের শুরুতেই নজরুলের সাহিত্য-জীবনের অবসান ঘটে। প্রথম যৌবনের আবেগ-উচ্ছ্বাস স্থিমিত হয়ে তখন তিনি অনেকটা স্থিতধী হয়ে উঠেছেন। ১৯৪২ সনে বাক্‌রুদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কয়েক বছর তিনি একাধারে কবিতা, গান-গজল, গল্প, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, অভিভাষণ ইত্যাদি যা কিছু লিখেছেন তা ইসলামী ভাব, আদর্শ, ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মবাদে পরিপুষ্ট। বলতে গেলে, তিরিশের কবিদের নাস্তিক্যবাদী-অবিশ্বাসী চিন্তা-চেতনা যখন এক শ্রেণীর তরুণদেরকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, নজরুলের এসব লেখা তখন অনেককেই বিভ্রান্তির হাত থেকে মুক্ত করে। ঐ সময় নজরুল ছিলেন সর্বাধিক উচ্চকণ্ঠ। কিন্তু ১৯৪২ সনে তিনি বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়ায় এ ধারাকে তখন চলমান রাখেন ফররুখ আহমদ ও উপরোক্ত মুসলিম কবিগণ। সৈয়দ আলী আশরাফ তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। ইসলামী ভাব, আদর্শ ও ঐতিহ্য-চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে তাঁর কাব্য-কবিতা।

চল্লিশের দশকে তিরিশোত্তর যুগের নাস্তিক্যবাদী, প্রগতিবাদী কবিদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক উচ্চকণ্ঠ কবি ফররুখ আহমদ। ফররুখের গভীর ঐতিহ্যবোধ, প্রগাঢ় আদর্শ চেতনা ও শাশ্বত মানবতাবোধের কাছে নাস্তিক্যবাদী-প্রগতিবাদীরা অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। ফররুখের কালজয়ী প্রতিভা তখন বিশ্বাসী কবিদের মনে এক নতুন আস্থা ও নির্ভরতা সৃষ্টি করে। এ বিশ্বাসময় প্রশ্রয়ে যাঁদের সাহিত্য-প্রতিভার স্ফূরণ ও বিকাশ ঘটে সৈয়দ আলী আশরাফ তাঁদেরই একজন।

আলী আশরাফের প্রতিভা ও অবদানের তুলনায় তিনি কম আলোচিত। এটা তাঁর জন্য যতটা নয়, আমাদের জন্য ততোধিক দুর্ভাগ্যজনক। তাঁর কবিতায় বিশুদ্ধ রুচি ও স্নিগ্ধ আবেগের প্রতিফলন ঘটেছে। সকালে সবুজ ঘাসের ডগায় স্বচ্ছ শিশিরবিন্দুর মত পরিচ্ছন্ন স্ফটিক সদৃশ তাঁর কবিতা। দুপুরের তীব্র দাহ নেই, প্রভাতের স্নিগ্ধ কোমলতা তাঁর কবিতার শরীরে নরম গোলাপের পাঁপড়ির মত ছড়ানো ছিটানো। অসাধারণ প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাথে সংহত আবেগের সংমিশ্রণে তাঁর কবিতার সৃষ্টি। এটাকে বলে আধ্যাত্মিকতা। ইসলামের গভীর উপলব্ধি ও মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের অভিপ্রায় থেকে এ আধ্যাত্মিকতার সৃষ্টি। তাঁর কবিতার প্রায় সর্বত্রই এ আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ ঘটেছে। অন্যদিকে, তাঁর গদ্য-রচনা গভীর মননশীলতা, ব্যাপক অধ্যায়ন ও তীক্ষ্ণ ধীরশক্তির পরিচয় বহন করে। তাঁর গদ্য রচনার মধ্যেও ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নিম্নোক্ত তালিকা থেকে এ কথার যথার্থ প্রমাণিত হবে।

কবিতাঃ □চৈত্র যখন□ [১৯৫৭], □বিসংগতি□ [১৯৭৪], □হিজরত□ [১৯৮৪], □সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা□ [১৯৯১], □রূবাইয়াতে জহীনি□ [১৯৯১] ও □প্রশ্নোত্তর□ [১৯৯৬]। অনুবাদঃ □ইভানকে ক্লেয়ারগল□ [১৯৬০], □প্রেমের কবিতা□ [সৈয়দ আলী আহসানের সাথে যৌথভাবে কৃত]।

গদ্যঃ □কাব্য পরিচয়□ [১৯৫৭], □নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়□ [দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৫], □বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য□, □সংসদ যুগঃ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের ইতিকথা□, □অন্বেষা□ [আধ্যাত্মিক জীবনের বর্ণনা]।

এছাড়া, ইংরেজি সাহিত্যের কৃতি ছাত্র ও অধ্যাপক সৈয়দ আলী আশরাফের প্রায় দু□ডজন ইংরেজি গ্রন্থ রয়েছে। এগুলো সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখা। শুধু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট নিয়ে নয়, আন্তর্জাতিক বা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে লেখা এসব গ্রন্থ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁকে একজন কৃতী সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ হিসাবে সুখ্যাতি দান করেছে। তাঁর চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও প্রতিভার সার্বিক পরিচয় জানার জন্য এগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন অপরিহার্য। আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সামাজিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এসব গ্রন্থ দিক-নির্দেশিকা স্বরূপ।

সৈয়দ আলী আশরাফ তাঁর কাব্য-চর্চার প্রেক্ষাপট বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ □কাব্য রচনা করেছি নিজেকে জানার জন্য, ভাষার মারপ্যাঁচ দেখাবার জন্য নয় বা কোন মতবাদ প্রচার করার জন্য নয়।□মানবিক প্রেমের আর বিরোধের রাজ্যে নিজেকে দেখেছি। কামনা, বাসনা, লোভ, হিংসার বিচিত্র দোলায় নিজেকে দোলায়িত অবস্থায় অনুভব করেছি। মানুষকে বিশ্বাস করে অকৃপণ বর্বরতার

আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছি। তবু মানুষের পরম সত্যের উপর বিশ্বাস হারাইনি বরঞ্চ এমন সমস্ত মহৎ আত্মার স্পর্শে আমার সত্তা জাগ্রত, উদ্দীপ্ত এবং আলোকিত হয়েছে যে মানবতার মহত্ত্বের উপর বিশ্বাস গাঢ়তর হয়েছে, সমাজের অসঙ্গতির অন্তরালে, সঙ্গতির উৎসের সন্ধান পেয়েছি এবং মানবাত্মার কল্যাণ কামনায় অসুন্দরের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছি।□ [সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা ভূমিকাংশ, প্রকাশঃ নভেম্বর, ১৯৯১, পৃ. ৭]

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে কবির কাব্য-চর্চার প্রেক্ষিত, উদ্দেশ্য, উপলব্ধি, মানবপ্রেম ও মানব চরিত্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই প্রেম অনিবার্য। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার প্রেম, সন্তানের প্রতি বাৎসল্য, মানুষের প্রতি প্রেম, জীবজন্তুর প্রতি প্রেম ইত্যাদি প্রেমের নানা প্রকারভেদ রয়েছে। এ মানবিক প্রেম জীবনকে মাধুর্যময় করে তোলে, মানুষকে করে উদার ও মহৎ। এ মানবিক প্রেমই আল্লা-প্রেমের অতল সলিল ধারার সাথে সংমিশ্রিত হয়ে প্রেমের পূর্ণ ও সফল পরিণতি ঘটায়। কবির এ সাধারণ প্রেম বা মানবপ্রেম ক্রমান্বয়ে আল্লাহ প্রেম বা আধ্যাত্মপ্রেমের অন্তহীন সাগরে বিলীন হয়ে যায়। এখানেই কবি মানবজীবনের পরম সার্থকতা অনুভব করেন। কবি তাই বলেন:

□মেজবানি শেষ হলো? এসো তবে, এখন দুজনে মুখোমুখি বসি এইখানে। রজনীগন্ধার গন্ধে আমোদিত মলয়-কূজন-এমন নিবিড়ভাবে বহুদিন বসিনি দুজন, বসিনি নিকটে।□ [জন্মদিন: চৈত্র যখন]

প্রিয়তমা পত্নীর নিবিড় সান্নিধ্যে যে মানবিক প্রেমের স্ফূলণ ঘটে, কবির নিকট সে প্রেমের পরিণতি কীরূপ তা নীচের কয়েকটি লাইনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে:

□যে মুহূর্তে প্রেম পায় বিশ্বাসের মধুর স্বাক্ষর তখনি শুধু এ নিবেদন বিশ্ব মুক্ত হয় প্রাণ হীন মরীচিকার হৃদয়হীন প্রেতনৃত্য থেকে, তখনি সৃষ্টির সত্য অনুভূত হয় শিরায় শিরায়। আমার প্রণয় তাই ঈমানের বলে বলীয়ান কর, হে রহিম, হে রহমানুর রহিম।□ [আস্‌ফালা সাফেলীন: হিজরত]

কবি মানবিক প্রেমের পরিণতি সম্পর্কে □সকাল□ পত্রিকায় তাঁর দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন : □আমার কবিতায় প্রথম দিকে মানবিক প্রেম এবং হতাশার সঙ্গে ঐশী প্রেমের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যেমন □বসন্ত□ কবিতায়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আত্মিক সাধনার ফলে যে নিত্য নব অভিজ্ঞতার সন্ধান পেয়েছি তার পরিণতি □হিজরত□ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। ইসলাম আমাকে তত্ত্ব দিয়েছে আর রূহানী সাধনা আমাকে জীবনকে নতুনভাবে দেখতে সাহায্য করেছে। এই সাধনায় অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছিলাম বলেই বিলেতে যেয়ে তাদের ভালোটা চয়ন করতে পেরেছি এবং ইসলামের মানদণ্ড যেহেতু আমার চিত্তে এবং চরিত্রের মধ্যে একাত্মতা লাভ করেছে, আমার দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য সভ্যতায় যা কিছু মূল্যবান এবং ইসলামী জীবন পদ্ধতির জন্য গ্রহণযোগ্য স্বীকার করে নিয়েছে।□ সৈয়দ আলী আশরাফের সাক্ষাৎকার : □সকাল□, সৈয়দ আলী আশরাফ বিশেষ সংখ্যা-১৯৯৭, সম্পাদনা- ইশাররফ হোসেন]।

ইউরোপের শিল্প বিপ্লব পাশ্চাত্য জগতে যে হতাশা, যান্ত্রিকতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় মানবিক বোধের বিপর্যয় ঘটিয়েছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সে হতাশা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়কে আরো দ্রুততর করে তোলে। এ অবসস্থার অবসান ঘটানোর আশ্বাস নিয়ে আসে কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র। ১৯১৭ সনে রাশিয়ায় এক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু মানবতার মুক্তি সাধনের আশ্বাস নিয়ে যে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলো তাতে লক্ষ লক্ষ লোককে অকাতরে প্রাণ দিতে হলো। মানুষের স্বাধীনতা হলো বিপন্ন, গণতন্ত্রের কণ্ঠ হলো রুদ্ধ এবং সমাজতান্ত্রিক লৌহ-যবনিকার অন্তরালে মানুষের বাক স্বাধীনতা হলো স্তব্ধ। গুটিকয়েক লোকের হাতে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও মানবতা বিরোধী এ সমাজতন্ত্রকে পাশ্চাত্য জগত প্রত্যাখ্যান করল। অন্যদিকে পাশ্চাত্য জগতও মানুষের মুক্তির জন্য কোন কল্যাণকর ব্যবস্থা দিতে ব্যর্থ হলো। ফলে যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ, পুঁজিবাদী শোষণ, সামাজিক অবক্ষয়, হতাশা ও বঞ্চনা যখন পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল, তখন আইরিশ কবি উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস্ [১৮৬৫-১৯৩৯] এবং ইংরেজ কবি [জন্মসূত্রে আমেরিকান পরে বৃটিশ নাগরিক] টমাস স্টিয়ার্নস্ এলিয়ট খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে হতাশা-বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে মানুষের মনে আস্থা ও নির্ভরতা সৃষ্টি করার প্রয়াস পেলেন। এলিয়টের The Waste Land এবং ইয়েটস্-এর Sailing to Byzantium-এ খ্রিস্টীয় মূল্যবোধকে উচ্চকিত করে তোলে। তাঁদের অন্যান্য লেখার মধ্যেও এ ভাবের প্রতিফলন ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও তাঁদের কবিতা ও লেখা দেশ-বিদেশে যথেষ্ট সাড়া জাগায়।

> সৈয়দ আলী আশরাফের মধ্যেও ইয়েটস্ ও এলিয়টের একটা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মানব-প্রকৃতি ও ইতিহাস আলোচনার মাধ্যমে তিনিও মানবিক মূল্যবোধ ও জীবনের চরম সত্য উপলব্ধি করে তার মাধ্যমে মানব-মুক্তির পথ অন্বেষণ করেছেন। বলাবাহুল্য, ইসলাম ও মহানবীর [স.] জীবনাদর্শের মধ্যেই তিনি মানবতার এ মুক্তিপথের সন্ধান

পেয়েছেন। তাঁর □হিজরত□, □বনি আদম, □বিসংগতি□, □দজ্জাল□, □শিরী ফরহাদ□, □ইতিহাস□, □আসফালা সাফেলীন□, □লাব্বায়েক□ প্রভৃতি কবিতায় তাঁর এ অন্বেষার পরিচয় বিধৃত। এলিয়ট ও ইয়েটস্ যেমন আধুনিক ভাবকল্পনা, রূপক, প্রতীক ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, সৈয়দ আলী আশরাফও তেমনি তাঁদের অনুসরণে রূপক, উপমা, প্রতীক ইত্যাদি ব্যবহার করে আধুনিক কাব্য-কৌশল অবলম্বন করে কবিতা রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর সচেতনতা ও পারদর্শিতা সম্পর্কে কারো কোন সন্দেহ নেই। তাঁর প্রতীক ব্যবহারের কৌশল অনেকটা ইয়েটস্ ও এলিয়টকে, চিত্রকল্প ব্যবহারের পদ্ধতি ডিলান টমাস ও অমিয় চক্রবর্তীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া, চিত্রকল্প ও রূপকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি □আল কুরআন□, □মুসলিম পুঁথি সাহিত্য□, □রুমীর মসনবী□ ও ফারসী কবি নিজামীর □ইউসুফ জোলায় খাঁ□ এবং □লায়লা মজনু□কেও কোন কোন ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন। তবে সব ক্ষেত্রেই তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, স্টাইল ও স্বকীয়তার পরিচয় স্পষ্ট।

সৈয়দ আলী আশরাফ ঐতিহ্য-সচেতন কবি। তাঁর কবিতায় ইসলামী আদর্শের সাথে মুসলিম ঐতিহ্যের এক অনিবার্য সংমিশ্রণ ঘটেছে। সব বড় কবিই মূলত ঐতিহ্যের অনুসারী। তাঁরা সকলেই নিজ নিজ ঐতিহ্যের অনুসরণে মহৎ কাব্য রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। সৈয়দ আলী আশরাফও ঐতিহ্যবাদী। তিনি তাঁর স্বকীয় ঐতিহ্যের আলোকে কবিতার সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন। প্রতীক ও রূপকের মাধ্যমে তিনি ঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তবে প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার সকলের নিকট এক রকম নয়। সৈয়দ আলী আশরাফের মতে, প্রতীক দুই ধরনের- ঐতিহ্য-সংশ্লিষ্ট ও বুদ্ধিজাত। এলিয়ট যেমন তাঁর □ওয়েস্টল্যান্ড□ কাব্যে খ্রিস্টীয় ভাবধারা, আর্থুরীয়ান রোম্যান্স এবং বিভিন্ন মধ্যযুগীয় ও গ্রীক উপকথা থেকে উপমা-প্রতীক আহরণ করে তাঁর নিজস্ব জীবনোপলব্ধির আলোকে নবরূপ দান করেছেন, ইয়েটস্ যেমন আইরিশ উপকথা থেকে প্রতীক সংগ্রহ করেছেন আবার সম্পূর্ণ নিজস্ব বুদ্ধিজাত প্রতীক-উপমাও সৃষ্টি করেছেন, সৈয়দ আলী আশরাফও তেমনি তাঁর জীবনের প্রধানতম অনুপ্রেরণার উৎস ঐশীগ্রন্থ আল কুরআন, মুসলিম ঐতিহ্য, ইতিহাস, ফারসী সাহিত্য, পুঁতিসাহিত্য থেকে অকাতরে উপমা-প্রতীক সংগ্রহ করে তাঁর নিজস্ব মনন ও আধুনিক কাব্য-ভাবনার উপযোগী করে তার প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে নজরুল-ফররুখের সাথে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কিছুটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে। ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্য-চেতনার ক্ষেত্রে পূর্বসূরী এ দুই কবির সাথে সৈয়দ আলী আশরাফের সাজুয্য ছিল একান্তই স্বাভাবিক।

নজরুল মুসলমানদের ধর্মীয় ঐতিহ্য থেকে ভাব, ভাষা, উপমা, উৎপ্রেক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমানদের ঘরোয়া জীবনের আচার-আচরণ থেকে বিভিন্ন চিত্র গ্রহণ করেও তিনি তাঁর কাব্য-কবিতায় স্বচ্ছন্দভাবে ব্যবহার করেছেন। এছাড়া, আরবী-ফারসী আয়াত, সম্পূর্ণ বাক্য বা অসংখ্য উপযোগী শব্দ ব্যবহার করেও তিনি বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ও বলিষ্ঠ কাব্য-ভাষা নির্মাণ করেছেন। ফররুখ আহমদ নজরুল-প্রদর্শিত এ ভাষা-রীতিকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন এবং মুসলিম ঐতিহ্য ও পুঁথি সাহিত্য থেকে বিভিন্ন শব্দ, রূপক, প্রতীক, উপমা ও রূপকল্প গ্রহণ করে আধুনিক রূপাঙ্গিকে তার অভিনব রূপ দান করেছেন তাঁর বিভিন্ন কাব্যে। তিনি □সিন্দবাদ□ ও □হাতেম তা□য়ী□ নামক মধ্যযুগীয় দুই প্রবাদ পুরুষকে সমকালীন বাঙালি মুসলমানের স্বপ্ন-কল্পনা ও আশা-প্রত্যাশার প্রতীক হিসাবে অভিনব কাব্য-সৌন্দর্যে রূপায়িত করেছেন। চল্লিশের দশকে □সিন্দাবাদে□র প্রতীকে ফররুখ □সাত সাগতের মাঝি□তে তৎকালীন বাঙালি মুসলমানের স্বপ্ন-কল্পনা ও স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাক্ষা প্রমূর্ত করে তুলেছেন এবং □হাতেম তা□য়ীর প্রতীকে তৎকালীন পাকিস্তানে মুসলিম সমাজের অবক্ষয়, নৈতিক অধঃপতন, দ্বন্দ্ব-কহল ইত্যাদির অবসান ঘটিয়ে তাদেরকে সাচ্চা মুসলমান হওয়ার ও মহৎ মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সৈয়দ আলী আশরাফও অনেকটা ফররুখ আহমদের মতোই মানবতার মুক্তি কামনা করেছেন। ব্যক্তিগত জীবন থেকে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে দ্বন্দ্ব-কলহ-সংঘাত, মিথ্যা ও অন্যায়ের যে বিস্তার ঘটেছে, তার মূলে রয়েছে স্বার্থান্ধ নাফ্সের আত্মকেন্দ্রিক প্রবণতা। একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য ও রূহানী শক্তির চর্চা বা আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমেই এ চিরন্তন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান ঘটতে পারে, অন্যায়-অশান্তি-মিথ্যার বিনাশ ঘটিয়ে সত্য, ন্যায় ও শান্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে। সৈয়দ আলী আশরাফের প্রায় সব কাব্যেই বিশেষত □হিজরত□, □রুবাইয়াতে জহীনি□, কাব্যে কবির এ প্রতীকী অনুভব অপরূপ কাব্যিক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। এজন্য কবি আল মাহমুদ সৈয়দ আলী আশরাফ সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তা যথার্থ বলেই মনে হয়। কবি আল মাহমুদ বলেন:

□তাঁর [সৈয়দ আলী আশরাফ] কবিতায় রয়েছে এমন ধরনের রহস্যময় আধ্যাত্মিক গুণ যা তাঁর সমসাময়িক কবিগণ প্রায় উপেক্ষা করেই আধুনিকতার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু সৈয়দ আলী আশরাফ ঐতিহ্য ও পরম আস্তিকতাকেই কবিতার উপজীব্য করে দূরে সরে যান। এই দূরে সরে যাওয়ার জন্য একটি কারণ সম্ভবত তাঁর দীর্ঘ প্রবাস যাপন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা সূত্রে ব্যাপকতর উদার মানসিক আদান-প্রদান।□বাংলা কবিতার অন্য একটা দিক যার নাম বিশ্বাসের নির্ভরতা তা সৈয়দ আলী আশরাফ আমাদের

দোদুল্যমান চিত্তচাঞ্চল্যের উপশম হিসাবে উপস্থিত করেছেন। বাংলা কবিতাকে দিগ্বিজয়ী করতে হলে এই কবিতা আমাদের একান্ত দরকার।

এ সম্পর্কে আবু রুশদের একটি মন্তব্য অতিশয় প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: তিনি [সৈয়দ আলী আশরাফ] জীবনের অসংশোধনীয় অযৌক্তিকতা ও ক্ষণভঙ্গুরতার মধ্য দিয়ে এক দুর্লভ অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ সন্ধানী এবং সর্বশেষ তিনি কিছুটা মরমী ধরনের অধ্যাত্মবাদের ও নিজের ধর্মের নিগূঢ় আশ্রয় সন্ধানী।ব্যক্তিগত প্রেম অতিক্রম করে তিনি স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, জীবনের হতাশা ও গ্লানি প্রবলভাবে মনের জোরের সঙ্গে অতিক্রম করে নিজের ধর্মের স্থায়ী আশ্রয় ও শীতল ছায়ায় এসে স্বস্তি পেয়েছেন। কিন্তু যেটা কবি হিসাবে তাঁর সবচেয়ে লক্ষ্যযোগ্য গুণ সেটা হলো তাঁর নিজস্ব কণ্ঠছাপ।দেশজ প্রভাবের বাইরে কবি মাঝে মধ্যে আন্তর্জাতিকতাও অর্জন করেছেন। সৈয়দ আলী আশরাফের কয়েকটি ধর্মীয় কবিতায় বিশ্বাসী অবস্থায় ও খোদার ইচ্ছের প্রতি প্রত্যয়দীপ্ত সমর্পণই বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এ ধরনের কবিতার মধ্যে কাবা শরীফ, হেরা, মদীনার উদ্দেশ্যে, মদীনা উল্লেখযোগ্য। বস্তুত তাঁর উপরোক্ত চারটা ধর্মীয় কবিতায় বিশ্বাস, আবেগ ও নতুন কাব্যিক ভাষার সমন্বয় অনেকটা সফলতার সাথে ঘটেছে।

সৈয়দ আলী আশরাফ ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র এবং পরবর্তী জীবনে দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর দক্ষতা ছিল অগাধ। তাই তাঁর কাব্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব ছিল একান্তই স্বাভাবিক। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ চৈত্র যখন-এ কবির ইংরেজি কাব্য পাঠের স্পষ্ট স্বাক্ষর বিদ্যমান। বিশিষ্ট কবি-সমালোচক সৈয়দ আলী আহসানের মতে এ গ্রন্থের প্রথম দুটি কবিতা ইংরেজ কবি বরার্ট ব্রাউনিং-এর মনোলোগের ধাঁচে রচিত। তিনি বলেন: বাংলা ভাষায় এই ভঙ্গিতে কখনো কবিতা রচিত হয়নি। ভঙ্গিটি বাংলা ভাষার গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তাও পরীক্ষিত হয়নি। সৈয়দ আলী আশরাফই প্রথম ব্যক্তি যিনি এই পরীক্ষার সূত্রপাত করেছিলেন। কিন্তু মাত্র দুটি কবিতায় এই পরীক্ষার বিবৃতি ঘটায় আমরা ভঙ্গীটির পরিণত রূপ দেখতে সক্ষম হলাম না। তবু একথা বলা যায়, এ ভঙ্গীটির সূত্রপাতের জন্য আলী আশরাফ প্রশংসা পাবার অধিকারী। [সৈয়দ আলী আহসান: সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা]

মনোলোগ বা স্বগতোক্তি যা আমরা পূর্বে সাধারণত নাটকে প্রত্যক্ষ করেছি, কবিতায় তা সাধারণত দেখা যায় না। আলী আশরাফ কবিতায় এ বিশেষ ভঙ্গীটি ইংরেজি কবিতা থেকে বাংলায় নিয়ে এসেছেন। এটা তাঁর ইংরেজি কবিতা পাঠেরই ফল। এ সম্পর্কে সৈয়দ আলী আশরাফ বলেন:

ইংরেজি সাহিত্যে ব্রাউনিং ড্রামাটিক মনোলোগে রচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন বিএ অনার্সের ছাত্র ছিলাম তখন ব্রাউনিং আমার বিশেষ প্রিয় কবি ছিলেন। নিশ্চয়ই তাঁর প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই আঙ্গিকে কাব্য রচনা করি।মনোলোগ মধুসূদন রচনা করে গেছেন- ব্রজঙ্গনা কাব্য। সার্থক মনোলোগ- দশরথের প্রতি কৈকেয়ী একটি সার্থক ড্রামাটিক মনোলোগ। [সৈয়দ আলী আশরাফের সাক্ষাৎকার, পূর্বোক্ত]

সৈয়দ আলী আশরাফের পূর্বসূরী কবি ফররুখ আহমদের মধ্যেই এ ভঙ্গীটি বিদ্যমান। তাঁর রচিত সাত সাগরের মাঝি কাব্যের অন্তর্গত বেশ কয়েকটি কবিতা এ মনোলোগ ভঙ্গীতি রচিত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ফররুখ আহমদেরও অনেক আগে এ মনোলোগ ভঙ্গীতে কাব্য রচনা করেছেন। একথা সেয়দ আলী আশরাফও উল্লেখ করেছেন। অতএব, সৈয়দ আলী আহসান বাংলা কাব্যে এ ভঙ্গীতে প্রথম কবিতা রচনার কৃতিত্ব সৈয়দ আলী আশরাফকে দিলেও সেটা যে যথার্থ নয়, তা উপলব্ধি করতে কষ্ট হয় না। অর্থাৎ বাংলা কাব্যে এ ভঙ্গীতে প্রথম কবিতা রচনার কৃতিত্ব মাইকেল মধুসূদনের এবং তারপর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিমান কবি ফররুখ আহমদ তাঁর প্রখ্যাত সাত সাগরের মাঝি কাব্যে এ ভঙ্গীতে বেশ কয়েকটি কালজয়ী কবিতা লিখে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। সৈয়দ আলী আশরাফ ইংরেজ কবি ব্রাউনিং, মধুসূদন ও ফররুখ আহমদের পরবর্তী কবি হিসাবে তাঁদেরকে সার্থকরূপে অনুসরণ করেছেন, তাতে সন্দেহ নেই।

এ কাব্যে তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধি, বিশ্বাস, প্রেম, অধ্যাত্মবোধ, প্রকৃতি, স্বদেশপ্রেম ফুটে উঠেছে। তবে এখানে তাঁর প্রকাশ-ভঙ্গী অনেকটা ভিন্ন ধরনের। কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করছি:

খুঁজেছি অনেক তাকে অন্ধকার মাঝরাতে বিদ্যুতের চকিত আভায় অথবা ধানের ক্ষেতে ফসলের নম্র পূর্ণতায় খুঁজেছি। [পূর্ণমান স্বদেশ: চৈত্র যখন]

অন্বেষার মাধ্যমেই নিজেকে জানা যায়। অন্বেষার মাধ্যমেই সত্যোপলব্ধি ঘটে। অন্বেষার মাধ্যমেই বিশ্বাসের প্রগাঢ়তা সৃষ্টি হয়, প্রেমের বিভিন্ন স্তরে পূর্ণতা আসে। ব্যক্তিগত প্রেম, মানবিক প্রেম, স্বদেশপ্রেম, অধ্যাত্মপ্রেম ক্রমান্বয়ে উচ্চাঙ্গ মার্গে তথা মহান স্রষ্টার

প্রতি অনাবিল প্রেমে উন্নীত হয়। মানুষ পরিণত হয় ইনসানে কামিলে। হাদীস শরীফে তাই বলা হয়েছে : ‘ফাকাদ আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু’- অর্থাৎ নিজেকে জান, তাহলে তোমার রব বা প্রভুকেও জানতে পারবে। ইংরেজিতে বলা হয়- Know thyself, অর্থাৎ নিজেকে জান। প্রত্যেক জ্ঞানের উৎসই এ অন্বেষা। হযরত ইব্রাহিম [আ.] এ অন্বেষার মাধ্যমেই তাঁর রব বা পরম সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। মহানবী [সাঃ] এ অন্বেষার বশবর্তী হয়েই দীর্ঘ পনের বছর হেরা পর্বতের গুহায় কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধও সত্যানুসন্ধানে বোধিবৃক্ষের ছায়ায় দীর্ঘকাল তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। আলী আশরাফের অন্বেষাও এভাবে তাঁকে এক জায়গায় এনে স্বিতধী করে। কবি বলেন :

‘অসীম সসীম তার মিলে গেছে সমুদ্র-উল্লাসে। অতনু প্রবাহ তার অন্তরের অন্তরীক্ষে বাজিয়েছে প্রত্যক্ষ কিঙ্কিনি।’

‘চৈত্র যখন’ কাব্যের প্রতিটি কবিতাই বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। এ কাব্যের প্রতিটি কবিতায়ই জিজ্ঞাসা আছে, অন্বেষা আছে এবং শেষ পর্যন্ত পাঠকের মনকে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট উপলব্ধির প্রান্তে নিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে, যা পাঠকের মনকে আশ্বস্ত করে, পরিতৃপ্তির আনন্দে উদ্ভাসিত করে তোলে। বিশ্বাসী কবির এ এক অপরিহার্য গুণ। এ কাব্যের অন্তর্গত ‘বনি আদম’ কবিতাটি সম্ভবত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ কবিতায় কাব্যের কেন্দ্রীয় ভাব পরিব্যক্ত হয়েছে। ছয় পর্বে বিভক্ত এ কবিতায় কবি মানব-জীবনের আদি-অন্ত, এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরূপ দার্শনিক প্রজ্ঞা ও কাব্যময়তার সমন্বয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। এক মহাকাব্যিক অনুভব একটি মাত্র কবিতায় ছন্দময় ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত হয়েছে। কবিতার প্রথম কয়টি লাইন এরূপ:

‘হে নবী আদম আমরা ভাসন্ত চন্দ্র পৃথিবীর বুকে ক্রমশঃ বর্ধন আর ক্রমশঃ বিক্ষয় শূন্যময় আমাদের গোধুলি জীবন।’ [বনি আদম: চৈত্র যখন]

সৈয়দ আলী আশরাফের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘বিসংগতি’। এখানে কবির আধ্যাত্ম সাধনার বিষয় কাব্যাকারে বর্ণিত হয়েছে। সাধনার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সূফী তত্ত্বে আধ্যাত্ম-সাধনার প্রথম স্তর হলো জিজ্ঞাসা ও অন্বেষার মাধ্যমে নিজেকে জানা। দ্বিতীয় স্তর হলো অধ্যাত্ম-গুরুর সাথে আধ্যাত্মিকভাবে একাত্ম হওয়া। তৃতীয় স্তর হলো আল্লাহর অস্তিত্বের সাথে নিজেকে বিলীন করে দেওয়া। সূফীরা যেটাকে বলেন ‘ফানাফিল্লাহ’। অর্থাৎ আধ্যাত্ম-সাধনার সর্বশেষ স্তরে উপনীত হওয়ার পর সাধক তাঁর নিজের জৈব-সত্তা বিস্তৃত হয়ে পরম স্রষ্টার শাশ্বত সত্তার সাথে একাত্মতা অনুভব করেন। এটা সাধকের সর্বোচ্চ মার্গ। ‘বিসংগতি’ কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় নিসর্গ, মানুষ, মানুষের বহিরঙ্গ ও অন্তর-রাজ্যের বিভিন্ন দোলাচল, পৃথিবীর নানা বাস্তবতার কবিত্বময় বর্ণনার মাধ্যমে কবি তাঁর অধ্যাত্মবোধকেই ব্যক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। নানা রূপক, উপমা, প্রতীকের মাধ্যমে কবি এই বোধকে আরো তাৎপর্যময় করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যেমন :

‘লঞ্চের লাঞ্ছনা শেষ। মুক্তপ্রাণ ছন্দবিদ্ধ হাওয়া; নরম বিছানা মাটি সদ্য ভেজা বর্ষণ সরস; ঝাঁ ঝাঁ দুপুরের মাঠে ভরামন আউষের সোনা; ছলছল নদীবেগ অস্পষ্ট অধরা তবু নাচে। সামনে সবুজ শাড়ি পাটক্ষেত; ভাঙা মনে জোড়া তীক্ষ্ণ-চিল; বিরহ সমৃদ্ধি ঘন কুহু, কুহু; কহু; ডাহুকও দরদী। তবুও অস্থিরচিত্ত। মনোলীন। যদিও বা ধান্যগন্ধী দেহ, মৃত্যুলগ্নী মোহের মোক্ষনে চিনেছি তো তারে।’ [বিসংগতি: বিসংগতি]

‘বিসংগতি’র কয়েকটি কবিতা ইংরেজ কবি এজরা পাউন্ড, ক্যান্টো, ই.ই. কামিংস-এর অনুসরণে লেখা। এখানেও কবির ইংরেজি কাব্য পাঠের প্রভাব স্পষ্ট। ‘বিসংগতি’র মধ্যে যে ভাব ও অনুভূতি কোরক মেলেছে কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘হিজরত’-এ তা পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়েছে। এখানে আত্মগত অনুভব পূর্ণ আধ্যাত্ম-চেতনার রূপ পরিগ্রহ করেছে। এখানে প্রতিটি কবিতায় আল্লাহ, রাসূল [সা.] ও ইসলামের সুমহান আদর্শের আবেগঘন বর্ণনা আছে। হজ্জব্রত পালন উপলক্ষে কবি মক্কা, মদীনা, আরাফাত ও অন্যান্য ঐতিহাসিক-ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গমনকে হিজরতের সাথে তুলনা করেছেন। হিজরতের প্রকৃত উদ্দেশ্য তো আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ বা আল্লাহর দীনের জন্য স্বগৃহ পরিত্যাগ করা। হজ্জের উদ্দেশ্যও তাই। তবে কবির এ হিজরতে বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক অভিযাত্রাই গুরুত্ব লাভ করেছে। সেদিক দিয়ে আলী আশরাফের এ কাব্য সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব ও অসাধারণ সংযোজন হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। এ সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসানের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

‘এ কাব্যগ্রন্থের ‘হিজরত’ এবং ‘লাব্বায়েক’ নামক কবিতা দুটি বাংলা কাব্য সাহিত্যে একটি নতুন সংযোজন। ঠিক এ ধরনের কবিতা বাংলা কাব্যের ইতিহাসে আর কখনো লিখিত হয়নি। ‘হিজরত’ কবিতাটিতে কবির আধ্যাত্মিক যাত্রাপথের রূপচিত্র পাই। বাস্তব জগতের প্রেম, লোভ, ক্ষয়ক্ষতি সব কিছু ত্যাগ কবি হিজরত করেছেন আল্লাহএবং রাসূলের নিকটতম সান্নিধ্য লাভের জন্য। এ কবিতাটি টি.এস. এলিয়টের ‘অ্যাশ ওয়েড্‌নেসডে’ [Ash Wednesday] কবিতাটির সঙ্গে তুলনীয়। এখানেও কবি এলিয়টের মত কয়েকটি প্রতীক ব্যবহার করেছেন যে সমস্ত প্রতীক আধ্যাত্মিক অবস্থার অনুভূতি জাগ্রত করে।’চতুর্থ কবিতাটিতে [লাব্বায়েক’]

ইয়েটসের "সেইলিং টু বাইজ্যান্টিয়াম" [Sailing to Byzantium] কবিতার প্রভাব লক্ষ্য করি। ইয়েটস্‌ও সন্ধান করেছেন চিরন্তনকে, এ কবিও চাচ্ছেন আল্লাহ ও রাসূলের সান্নিধ্য লাভের পর এই ক্ষয়িষ্ণু দুনিয়াতে চিরন্তনকে। মদীনা মুনাওয়ারাকে সেই চিরন্তনের প্রতীক হিসাবে দেখেছেন এবং রাসূল (সা.]-এর মধ্যে সেই "নিবেদন অমরত্বে"র সন্ধান পেলেন তাই কবি সম্পূর্ণ নতুন অর্থ যোজনা করে বাংলা পুরাতন রূপকল্পকে প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করেছেন- এবং একটি সম্পূর্ণ নতুন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।" [পূর্বোক্ত]।

"হিজরত" কাব্যটি কবির রূহানী পীর "হজরত বাবা শাহ তাজী রহমাতুল্লাহ আলায়হের স্মরণে" উৎসর্গীকৃত। তিনি সৈয়দ আলী আশরাফের আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন। কবি তাঁর আধ্যাত্মিক গুরুর সান্নিধ্যে এসে যে উপলব্ধি ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, সেটারই পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর এ কাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। মূলত এটা গতানুগতিক কোন ধর্মীয় কাব্য নয়।

ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে কবি আধুনিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাই এখানে আবেগের যেমন প্রশ্রয় আছে তেমনি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতারও প্রকাশ ঘটেছে।

কবির পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের নাম : "রূবাইয়াত এ জহিনী"। এখানেও কবির আধ্যাত্ম-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। এ কাব্য সম্পর্কে সৈয়দ আলী আশরাফ যে কথা বলেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য। কবি বলেন : "মানবিক প্রেম ও ঐশীপ্রেম এ দুয়ের প্রকাশ আমার কাব্যে রয়েছে এবং মানবিক প্রেম থেকে ঐশীপ্রেমের পথে যে যাত্রা এবং যে নতুন রূপ তা "রূবাইয়াত এ জহিনী"-তে ভালভাবেই প্রকাশিত হয়েছে।" একটি উদাহরণ:
"প্রিয়ারে আমার শুকরিয়া দিই; শান্ত ঘরের মন্ত্রণায় আমারে কখনো বন্দী করেনি গল্পগুজব সান্ত্বনায় আগুনে পুড়িয়ে কঠিন জ্বালায় আমারে করেছে দীপ্ত শিখা সেই আলো দিয়ে তোমারে চিনব-মিলাবে মিটাবে অন্তরায়।" [রূবাইয়াৎ-ই-জহীনী]

সৈয়দ আলী আশরাফের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ "প্রশ্নোত্তর"। এ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে: "প্রশ্নোত্তর বইতে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পরম সত্তার সঙ্গে নিজস্ব পরিচিতির আনন্দ যেমন পরিবেশন করতে চেষ্টা করেছেন, তেমনি সেই সত্তার সঙ্গে অপরিচয়ের অন্ধত্ব এবং তার ফলগত ক্রুরতা ও স্বার্থপরতার বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রশ্ন করেছেন কেন এই অপরিচয়? অন্তরাত্মায় বেদনাক্ত যে উত্তর উদিত হচ্ছে কবি তা-ই এ বইতে প্রকাশ করেছেন।"

সৈয়দ আলী আশরাফ মুসলিম ঐতিহ্য, ইসলামী জীবনবোধ ও গভীর আধ্যাত্ম-চেতনাসম্পন্ন একজন আধুনিক কবি। বাংলা কাব্যে এটা কোন নতুন বিষয় নয়; মধ্যযুগে শাহ মোহাম্মদ সগীর থেকে এর উৎপত্তি এবং বিভিন্ন যুগে অসংখ্য মুসলিম কবির কাব্য-কবিতায় এর রূপায়ণ ঘটেছে বিভিন্নভাবে। আধুনিক যুগে নজরুল-ফররুখ এ ধারার সর্বাদিক উল্লেখযোগ্য কবি। সৈয়দ আলী আশরাফ তাঁদেরই সার্থক উত্তরসূরী। তবে তাঁর আধ্যাতিত্মক বোধ ও জীবন-অভিজ্ঞতার রূপায়ণ ও নিজস্ব কাব্যভাষা নির্মিতির ক্ষেত্রে তাঁর সচেতন-সক্ষম প্রয়াস তাঁকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এদিক দিয়ে তাঁর কাব্য-মূল্য কম নয়। এ কারণে তিনি একজন বিশিষ্ট কবি হিসাবে বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

এছাড়া, শিক্ষা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ উন্নয়ন ও ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর যে অসামান্য অবদান রয়েছে সেজন্য তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত। এসব বিষয়ে ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় তাঁর রচিত বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি তাঁকে বিশ্বে জ্ঞানী-গুণী মহলে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

সূত্রঃ সাহিত্য ত্রৈমাসিক প্রেক্ষণ অক্টবর-ডিসেম্বর ২০০৬ (সৈয়দ আলী আশরাফ স্মরণ)

মুহম্মদ মতিউর রহমান

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান এর জন্ম ৩ পৌষ, ১৩৪৪ (১৯৩৭ ইং) সন, সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত শাহজাদপুর থানার চর নরিনা গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস উক্ত একই উপজেলার চর বেলতৈল গ্রামে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সনে বাংলায় এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবনে তিনি সিদ্বেশ্বরী কলেজ ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে অধ্যাপনা করেছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকল্পে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সংগঠক হিসেবে তাঁর রয়েছে বৈচিত্রময় ভূমিকা। তিনি ঢাকাস্থ "ফররুখ একাডেমীর" প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং বাংলা একাডেমীর জীবন সদস্য।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য কথা (১৯৯০), ভাষা ও সাহিত্য (১৯৭০), সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি (১৯৭১), মহৎ যাদের জীবন কথা (১৯৮৯), ইবাদতের মূলভিত্তি ও তার তাৎপর্য (১৯৯০), ফররুখ প্রতিভা (১৯৯১), বাংলা সাহিত্যের ধারা (১৯৯১), বাংলা ভাষা ও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন (১৯৯২), ইবাদত (১৯৯৩), মহানবী (স) (১৯৯৪), ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি (১৯৯৫), মহানবীর (স) আদর্শ সমাজ (১৯৯৭), ছোটদের গল্প (১৯৯৭), Freedom of Writer (১৯৯৭), বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য (২০০২), মানবাধিকার ও ইসলাম (২০০২), ইসলামে নারীর মর্যাদা (২০০৪), মাতা-পিতা ও সন্তানের হক (২০০৪), রবীন্দ্রনাথ (২০০৪), স্মৃতির সৈকতে (২০০৪)। এছাড়াও তাঁর সম্পাদনায় ফররুখ একাডেমী পত্রিকা প্রকাশিত হয়।